ইউনিট
১৭

খ্রীষ্টধর্ম

ভূমিকা

এই ইউনিট বা অধ্যায়ে খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। বাইবেলে যা-কিছু বর্ণিত তা আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। পাপময় জগতের দূষিত ও কলুষিত পরিবেশের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। মানুষের অন্তরের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে এই পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী সুখ, শান্তি ও আনন্দ লাভ করা। কিন্তু জগতের প্রত্যক্ষ বাস্তবতায় তা সুদূর পরাহত। মানুষের চারপাশে এবং সমাজ-জীবনে অসংখ্য প্রতিকূলতা, বাধা-বিঘ্ন ও পরীক্ষা-প্রলোভন থাকে। বস্তুত, মানুষ তার নিজের মধ্যেই একটি দ্বন্দ্ব অনুভব করে যার ফলে সে যা করতে চায় তা না করে তার বিপরীতটাই করে বসে। বাইবেলের ভাষায় এটাই হলো মানুষের হৃদয়পটে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের লিখে দেওয়া ভালবাসার বিধানের বিরোধিতা বা অবাধ্যতা। এর ফলে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, যিনি তার জীবনের উৎস, ভিত্তি ও পরমগতি, তাঁর সাথে তার যেরূপ সম্পর্ক থাকার কথা তা আর থাকে না; সে হয়ে পড়ে বিচ্ছিন্ন। ফলে সে নিজের সাথে, ভাই মানুষের সাথে ও বিশ্বসৃষ্টির সাথে সুষম সম্পর্ক গড়ে তুলতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এক কথায় একে বলা যায় অনাসৃষ্টি। তখন মানুষ তার নিজের মধ্যেই অনুভব করে নিঃসঙ্গতা, সম্পর্কবিহীনতা, পাপময়তা। এ কথা সত্য যে, মানব-স্বভাবের মধ্যে রয়েছে ইন্দ্রিয়ের কামনা-বাসনা এবং সপ্তরিপুর অদম্য সন্ত্রাসী তৎপরতা যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আর তারই ছিটেফোঁটা বাইরে প্রকাশ পায়। জ্ঞানী-গুণী সাধক ও ধর্মবিশারদগণ মানুষকে ইন্দ্রিয়সংযমী হওয়ার পথ দেখান এবং উপদেশ ও পরামর্শ দেন। ধর্মগ্রন্থেও এসব জয় করার উপায় হিসেবে নানা বিধি-বিধান এবং তা পালনের নির্দেশ দেওয়া আছে। কিন্তু এমন কোন মন্ত্র বা শক্তি নেই যা মানুষের পাপময় অবস্থাকে রূপান্তরিত করে পৃথিবী নামক গ্রহটিকে ভূ-স্বর্গে পরিণত করতে পারে। মানুষকে ঈশ্বর স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং ভালবাসার আদেশ দিয়েছেন। স্বাধীন ইচ্ছা ব্যবহার বা প্রয়োগ করে সেই ঐশ্বরিক বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করলে মানুষ পাপময় অবস্থা থেকে মুক্তির স্বাদ পেতে পারে, কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা মঙ্গলময় এবং একমাত্র তিনিই সর্বজ্ঞ। একমাত্র তাঁর সেই আদেশ পালনের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ও মুক্তি নিহিত। এই ইউনিটে আমরা খ্রীষ্টধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে এ জগতে অর্থপূর্ণ জীবনযাপনের ও অনন্ত পরিত্রাণ লাভের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করব।

পাঠ-১ : খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (যোহন ১:১–৫, ৯-১৪,১৬)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- যীশুর মানব-স্বভাব ও ঐশ্বরিক স্বভাব সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- যীশু যে মানবজাতির ত্রাণকর্তা তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঈশ্বর যে মানুষকে অসীমরূপে ভালবাসেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যীশুই যে ঈশ্বরপুত্র তা বলতে পারবেন।
- ঈশ্বরপুত্র যে মানবদেহ ধারণ করে জন্ম নিয়েছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

আদিতে ছিলেন বাণী; বাণী ছিলেন ঈশ্বরের সঙ্গে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। আদিতে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গেই ছিলেন। তাঁর দ্বারাই সব-কিছু অস্তিত্ব পেয়েছিল এবং যা-কিছু অস্তিত্ব পেয়েছিল, তার কোন-কিছুই তাঁকে ছাড়া অস্তিত্ব পায়নি। তাঁর মধ্যে ছিল জীবন; সেই জীবন ছিল মানুষের আলো; অন্ধকারে সেই আলোর উদ্ভাস; আর অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

যিনি সেই সত্যকার আলো, যে-আলো প্রতিটি মানুষের অন্তর উদ্ভাসিত করে, তিনি জগতে প্রবেশ করছিলেন। জগতের মধ্যেই ছিলেন তিনি আর যদিও জগৎ তাঁর দ্বারাই অস্তিত্ব পেয়েছিল, তবুও জগৎ তাঁকে চিনল না। তিনি এসেছিলেন আপন গৃহে, অথচ তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না। কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তাঁর প্রতি যারা বিশ্বাসী হয়ে উঠল, তাদের সবাইকে তিনি দিলেন ঈশ্বর-সন্তান হওয়ার অধিকার। রক্তগত জন্মে নয় – দেহের বাসনা থেকে নয়, পুরুষের কামনা থেকেও নয় – তাদের এই জন্ম ঈশ্বর থেকেই।

বাণী একদিন হলেন রক্তমাংসের মানুষ; বাস করতে লাগলেন আমাদেরই মাঝখানে। আর আমরা তাঁর মহিমা প্রত্যক্ষ করলাম, একমাত্র পুত্র হিসাবে পিতার কাছ থেকে পাওয়া সেই যে-মহিমা – ঐশ অনুগ্রহ ও সত্যের সেই যে-পূর্ণতা।

সত্যিই তো আমরা সকলে তাঁর সেই পূর্ণতা থেকে লাভবান হয়েছি : লাভ করেছি অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ। মোশীর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল বিধান, কিন্তু সেই অনুগ্রহ, সেই সত্য নেমে এসেছে যীশুখ্রীষ্টেরই মাধ্যমে। ঈশ্বরকে কেউ কখনো দেখেনি। পিতার হৃদয়ের কাছেই যাঁর আপন স্থান, নিজে ঈশ্বর যিনি, সেই একমাত্র পুত্রই তাঁকে প্রকাশ করেছেন।

সারসংক্ষেপ : খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হলেন যীশুখ্রীষ্ট। তিনি এক কুমারী মায়ের গর্ভে জন্মেছিলেন। "আদিতে ছিলেন বাণী ..... আমাদের মাঝে নিবাস স্থাপন করলেন।" (যোহন ১:১–১৪)। যীশু যোহন কর্তৃক দীক্ষাস্নাত হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে এই বাণী ধ্বনিত হলো: "ইনি আমার প্রিয় পুত্র। তোমরা এঁর কথা শোন।" যীশুর শিক্ষা অনুসরণ করে পিতার উপর বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসায় জীবন যাপন করলে মানুষের জীবন অর্থপূর্ণ হয়।

"যীশু যে ঈশ্বর-পুত্র, যারা এই কথা স্বীকার করে, ঈশ্বর তাদের সবারই অন্ড়রে বাস করেন আর তারাও বাস করে ঈশ্বরের আশ্রয়ে। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে-ভালবাসা, তা আমরা জেনেছি আর তার ওপর বিশ্বাসও রেখেছি। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। ভালবাসায় যার আবাস, সে বাস করে ঈশ্বরের আশ্রয়ে আর ঈশ্বরও তার অন্তরে বাস করেন। আমাদের অন্ড়রে ভালবাসার পূর্ণতা এতেই প্রকাশ পায় যে, সেই বিচারের কথা ভেবে আমরা নির্ভয়ে থাকতে পারি; পারি এই জন্যেই যে, যীশু যেমনটি আছেন, আমরা এখন এই জগতে থেকেই তেমনটি হয়ে উঠেছি। ভালবাসার মধ্যে কোন ভয় থাকতেই পারে না, বরং পূর্ণ ভালবাসা ভয়কে দূরে সরিয়ে দেয়। আমরা যে ভালবাসি, তার কারণ, ঈশ্বর নিজেই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন। কেউ যদি বলে, সে ঈশ্বরকে ভালবাসে, আর তবুও সে যদি নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, তবে সে মিথ্যাবাদী; কারণ যাকে সে দেখতে পায়, তার সেই ভাইকে সে যখন ভালবাসে না, তখন যে-ঈশ্বরকে সে দেখতে পায় না, তাঁকে সে তো ভালবাসতেই পারে না! (১যোহন ৪: ১৫–২১)।

খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস, যীশু কেবল দু'হাজার বছর আগেকার ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বই নন। তিনি পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত; বিশ্বসৃষ্টির উপর তাঁর প্রভুত্ব। কিন্তু এই প্রভুত্ব বা কর্তৃত্বের উৎস কোন জাগতিক পদমর্যাদা, পদাধিকার বা ক্ষমতা নয়। পুনরুত্থিত খ্রীষ্টের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের উৎস হচ্ছে তাঁর আমৃত্যু ভালাবাসার শক্তি বা ক্ষমতা। সাধু পল তাই বলেন, "আধ্যাত্মিক অর্থে পরিণত মানুষ যারা, তাদের কাছে আমরা অবশ্যই জ্ঞানের কথা শুনিয়ে থাকি; তবে সে জ্ঞান এই সংসারের জ্ঞান নয়, এবং এ সংসারের নিয়ন্তা যারা, ধ্বংসের পথেই চলেছে যারা, তাদেরও জ্ঞান নয়। আমরা বরং শুনিয়ে থাকি পরমেশ্বরের এক রহস্যময় জ্ঞানেরই কথা, সেই প্রচ্ছন্ন জ্ঞানেরই কথা, যে-জ্ঞান লাভ ক'রে আমরা মহিমাধন্য হব ব'লে তিনি চিরকাল থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন। এই সংসারের কোন নিয়ন্তাই সেই জ্ঞানের কথা জানতে পারেনি। তারা যদি তা জানত, মহিমময়

প্রভু যিনি, তাঁকে তারা কখনোই ক্রুশে দিত না। আমরা কিন্তু সেই তেমন-সবকিছুর কথাই জানিয়ে থাকি, যার প্রসঙ্গে শাস্ত্রে লেখা আছে : 'ওই সব-কিছু কারও চোখ দেখেনি কখনো, কারও কানও শোনেনি কখনো; কারও মনও ভাবেনি কখনো। যারা পরমেশ্বরকে ভালবাসে, তাদের জন্যই তিনি ওই সব-কিছু সঞ্চিত করে রেখেছেন।" (১ করিন্থীয় ২:৬-৯)।

মনে রাখুন

যারা তাঁকে গ্রহণ করল, তাঁর প্রতি যারা বিশ্বাসী হয়ে উঠল, তাদের সবাইকে তিনি দিলেন ঈশ্বর-সন্তান হওয়ার অধিকার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশু যে ঈশ্বর-পুত্র, যারা এই কথা স্বীকার করে তাদের কী হয়?

(ক) ঈশ্বর তাদের অন্তরে বাস করেন
(খ) ঈশ্বর তাদেরকে পুরস্কৃত করেন
(গ) ঈশ্বর তাদেরকে ধনবান করেন।
(ঘ) ঈশ্বর তাদেরকে দীর্ঘজীবি করেন।

২। বাণী একদিন রক্তমাংসের মানুষ হয়ে কোথায় বাস করতে লাগলেন?

(ক) বেথলেহেমে
(খ) নাজারেথে
(গ) জেরুশালেমে
(ঘ) আমাদের মাঝখানে

৩। দেহধারী ঈশ্বরপুত্রকে যারা গ্রহণ করে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে তারা কী পায়?

(ক) খ্রীষ্টীয় নাগরিকত্ব
(খ) খ্রীষ্টান প্রতিষ্ঠানে চাকুরি
(গ) ঐশরাজ্যের উত্তরাধিকার
(ঘ) ঈশ্বর-সন্তান হওয়ার অধিকার

৪। মোশীর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল বিধান, আর যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে :

(ক) প্রাবক্তিক বাণী
(খ) অনুগ্রহ ও সত্য
(গ) ঐশ্বর্য ও পরাক্রম
(ঘ) প্রজ্ঞা ও মহিমা

৫। ঈশ্বরকে কে প্রকাশ করেছেন?

(ক) প্রবক্তাগণ
(খ) সাধুসন্তরা
(গ) একমাত্র পুত্র যিনি নিজেই ঈশ্বর
(ঘ) স্বর্গের দূতগণ

পাঠ-২: খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা (যোহন ১৫:৯–১৪, ১৭;মথি ৫:৩-১২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষাগুলো কী, তা বলতে পারবেন।
- মানুষের কাছে ঈশ্বরের আহ্বান কি, তা বলতে পারবেন।
- প্রকৃত সুখলাভের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- যীশুর অষ্ট সুখ-পন্থা সম্বন্ধে বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

(ক) পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি। তোমরা আমার ভালবাসার আশ্রয়ে থেকো। যদি আমার সমস্ত আদেশ পালন কর, তবেই তোমরা আমার ভালবাসার আশ্রয়ে থাকবে, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আদেশ পালন করেছি আর আছি তাঁর ভালবাসার আশ্রয়ে। এ সব কথা তোমাদের বললাম, যাতে আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে থাকতে পারে এবং তোমাদের আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হতে পারে।

আমার আদেশ হল এই : আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসবে। বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই। তোমরা আমার বন্ধু – অবশ্য আমি তোমাদের যা করতে বলছি, তোমরা যদি তা-ই কর। ... তোমাদের আমি এই আদেশ দিচ্ছি : তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে!"

(খ) একদিন লোকে ভিড় দেখে যীশু কাছের পাহাড়টায় গিয়ে উঠলেন। তিনি সেখানে বসলেন; তখন শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন এবং তিনি তাঁদের উপদেশ দিতে সুরু করলেন। তিনি এই কথা বললেন:

"অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা – স্বর্গরাজ্য তাদেরই।
দুঃখে-শোকে কাতর যারা, ধন্য তারা – তারাই পাবে সান্ত্বনা!
কোমলপ্রাণ বিনম্র যারা, ধনা তারা – প্রতিশ্রুত দেশ একদিন হবে তাদেরই আপন দেশ।
ধার্মিকতার দাবি পূরণের জন্যে তৃষিত ব্যাকুল যারা, ধন্য তারা – তারাই পরিতৃপ্ত হবে।
দয়ালু যারা, ধন্য তারা – তাদেরই দয়া করা হবে।
নির্মল যাদের অন্তর, ধন্য তারা – তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।
শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা – তারাই ঈশ্বরের সন্তান ব'লে পরিচিত হবে।
ধর্মনিষ্ঠ ব'লে নির্যাতিত যারা, ধন্য তারা – স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

আর ধন্য তোমরা, আমার জন্যে লোকে যখন তোমাদের অপমান করে, নির্যাতন করে, যখন তোমাদের নামে তারা নানা মিথ্যা অপবাদ রটায়। তখন আনন্দ ক'রো, উল্লাস ক'রো তোমরা, কারণ স্বর্গলোকে তোমাদের জন্যে সঞ্চিত হয়ে আছে এক মহা পুরস্কার। তোমাদের আগেকার প্রবক্তারাও তো ঠিক একই ভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন।"

সারসংক্ষেপ: ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, তিনি নিখিল বিশ্বের প্রভু। তিনি বিশ্বচরাচরের সমস্ত কিছুই সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি তাঁর নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি অনেক মর্যাদা দিয়ে, স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন ইহজগতে ও পরজগতে তাঁর সান্নিধ্যে সুখময় জীবন যাপন করার জন্য। মানুষের কাছে ঈশ্বরের আহ্বান হচ্ছে ঈশ্বরসন্তানসুলভ ভক্তি ও ভালবাসার পথ অবলম্বন করে, ঈশ্বরের ভালবাসার আদেশ পালন করে পবিত্র হয়ে ওঠা। যীশু বলেন: "স্বর্গে বিরাজমান তোমাদের পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদেরও হতে হবে সম্পূর্ণ পবিত্র" (মথি ৫:৪৮)।

অষ্ট কল্যাণবাণী বা সুখ-পন্থা হচ্ছে যীশুর শিক্ষার সারকথা। আসলে প্রকৃত সুখী মানুষের চিত্র বর্ণিত হয়েছে এই কল্যাণবাণী বা সুখ-পন্থায়। মানুষ মাত্রই তো সুখী হতে চায়। সুখী হতে চাওয়া হচ্ছে মানুষের মনের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই মানুষ প্রতিনিয়ত সাধনা করে। এই সাধনপথ কষ্টসাধ্য কিন্তু এর পরিণাম শুভ। যীশু নিজেই এই পথের দিশারী। একমাত্র যীশুই প্রকৃত সুখী মানুষ যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। আমরাও সবাই সুখলাভের জন্য আহূত।

"ঈশ্বর আমাদের এই পৃথিবীতে রেখেছেন যেন আমরা তাঁকে জানতে, ভালবাসতে ও সেবা করতে পারি, এবং এভাবে স্বর্গে যেতে পারি। পরমসুখ আমাদেরকে "ঐশস্বরূপ" ও অনন্ড় জীবনের সহভাগী করে তোলে। পরমসুখ নিয়ে মানুষ প্রবেশ করে খ্রীষ্টের গৌরবে ও ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের জীবনানন্দে। এই পরমসুখ মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতার অতীত। পরমসুখ ঈশ্বরের অনুগ্রহপুষ্ট স্বেচ্ছাকৃত দান থেকেই আসে: সেই কারণে, ঐশ্বরিক আনন্দে প্রবেশ করার জন্য প্রদত্ত অনুগ্রহ যেমন অলৌকিক,

ঠিক তেমনি পরমসুখও অলৌকিক। আমাদের জন্য প্রতিশ্রুত পরমসুখ আমাদের নিকট দাবি করে দৃঢ়তার সঙ্গে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আমাদের অন্তরকে কুপ্রবৃত্তি থেকে পবিত্র করার জন্য, ও সর্বোপরি ঈশ্বরের ভালবাসার সন্ধান করার জন্য পরমসুখ আমাদের আহ্বান জানায়। পরমসুখ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, কোন সম্পদ বা সুস্বাস্থ্য, মানুষের খ্যাতি বা ক্ষমতা, অথবা কোন মানবীয় কাজ – তা যত উপকারই করুক-না-কেন – যেমন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা শিল্প, অথবা কোন সৃষ্টজীবের মধ্যে, সত্যিকারের সুখ পাওয়া যায় না। তা পাওয়া যায় একমাত্র ঈশ্বরের কাছে যিনি সকল মঙ্গল ও প্রেমের উৎস" (খ্রীষ্টীয় পরমসুখ, ধর্মশিক্ষা ১৭২১-১৭২৩)।

মনে রাখুন

যীশু বলেন : "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন! আমাকে পথ ক'রে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।"

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশুর কথা অনুসারে আমাদেরকে কেমন হতে হবে?

(ক) জ্ঞানী ও পন্ডিত
(খ) শিক্ষিত ও কৌশলী
(গ) সম্পূর্ণ পবিত্র
(ঘ) ভদ্র ও মার্জিত

২। সত্যিকারের সুখ কীভাবে পাওয়া যায়?

(ক) দৈহিক সুস্থতা থেকে
(খ) মানসিক শান্ড়ি থেকে
(গ) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থেকে
(ঘ) একমাত্র ঈশ্বরের কাছে

৩। যাদের অন্তর নির্মল, তাদের কী হবে?

(ক) তারা মনে শান্ড়ি পাবে
(খ) তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে
(গ) তারা মানুষের প্রশংসা পাবে
(ঘ) তারা জাতীয় পুরস্কার পাবে

৪। যীশুর কথা অনুযায়ী সবচাইতে বড় ভালবাসা কোন্‌টি?

(ক) দেশের জন্য জীবন দান
(খ) যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ
(গ) ধনসম্পদ গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া
(ঘ) বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া

পাঠ-৩ : প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম (লুক ১০:২৫–৩৭)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শাশ্বত জীবন লাভের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আমাদের প্রতিবেশী কে, তা বলতে পারবেন।
- দস্যুহস্তে পতিত আহত লোকটির প্রতি দয়াদ্র সেবার কাহিনী বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

একদিন যীশুকে যাচাই করার জন্য একজন বিধানপন্ডিত এগিয়ে এসে তাঁকে প্রশ্ন করলেন : "গুরু, শাশ্বত জীবন-সম্পদ লাভ করতে হলে আমাকে কী করতে হবে?" যীশু তাঁকে বললেন : "মোশীর বিধান-গ্রন্থে কী লেখা আছে? আপনি তার কী অর্থ করছেন?" উত্তরে তিনি বললেন : "তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আর তোমার সমস্ড় মন দিয়ে! আর তোমার প্রতিবেশীকেও তুমি নিজের মতোই ভালবাসবে!" যীশু তখন বললেন : "আপনি ঠিক জবাব দিয়েছেন। এখন তা-ই করুন, তাহলেই (শাশ্বত) জীবন পাবেন আপনি!"

কিন্তু বিধানপন্ডিত কেন যে ওই প্রশ্ন করেছেন, তা বোঝাবার জন্যেই তখন যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন : "আচ্ছা, আমার প্রতিবেশী কে?" উত্তরে যীশু বললেন : "শুনুন! একজন লোক একটি জেরুসালেম থেকে জেরিখো-শহরে নেমে আসছিল; এমন সময়ে সে একদল দস্যুর হাতে পড়ল। তারা তার যা-কিছু ছিল, সবই লুঠ করে নিল; তারপর তাকে খুব মারধর করে আধমরা অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল। এখন হল কি, একজন যাজক সেই পথ দিয়ে আসছিলেন; তিনি ওই লোকটিকে দেখে পথের ওধার দিয়ে পাশ কাটিয়েই চলে গেলেন। তেমনি একজন লেবীয়ও সেই জায়গায় এসে পড়লেন আর লোকটিকে দেখে তিনিও পথের ওধার দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। এবার কিন্তু একজন সামারীয় পথিক যেতে যেতে তার কাছে এসে পড়ল; তাকে দেখে তার প্রাণটা কেঁদে উঠল। সে তখন তার কাছে এগিয়ে এল; তার সমস্ড় ক্ষতের ওপর তেল ও সুরা ঢেলে সে তা বেঁধে দিল। তারপর নিজের বাহনটির পিঠে চাপিয়ে সে তাকে একটা সরাখানায় নিয়ে গেল আর সেখানে তার সেবাযত্ন করতে লাগল। পরের দিন সে দু'টো রুপোর টাকা বের করে সরাইখানার মালিকের হাতে দিল আর বলল : "আপনি এই লোকটির সেবাযত্ন করুন; যদি কিছু-বেশি খরচা হয়, আমি আপনাকে ফেরার পথে তা মিটিয়ে দিয়ে যাব।'" যীশু এবার বললেন : "আচ্ছা, আপনার কী মনে হয়? যে-লোকটি দস্যুদলের হাতে পড়েছিল, ওই তিনজনের মধ্যে কে তার প্রকৃত প্রতিবেশী হয়ে উঠল?" বিধানপন্ডিত উত্তর দিলেন : "যে তাকে দয়া করেছিল, সে-ই"" তখন যীশু তাঁকে বললেন : "তাহলে এখন যান আর আপনিও ওই রকম কাজই করুন!"

সারসংক্ষেপ : খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে যীশুখ্রীষ্টকে অর্থাৎ একজন জীবন্ড় ব্যক্তিকে অনুসরণ করা। প্রকৃতপক্ষে প্রথম খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ নিজেদেরকে একটি বিশেষ 'পথের' অনুসারী বলে পরিচয় দিতেন। আর সেই 'পথ' বলতে তারা বুঝতেন যীশুখ্রীষ্টকে। শিষ্যদেরকে আহ্বান দেওয়ার সময় যীশু বলেছিলেন : "আমাকে অনুসরণ কর।" যীশু বলেন : 'আমি সত্য, আমি পথ, আমি জীবন'। যে আমাতে বিশ্বাস করে, যে আমার আদেশ পালন করে সে .... ইহজগতে ও পরজগতে অনন্ত জীবন পায়। "আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসবে"।

ঈশ্বর সম্বন্ধে যীশুর মূল শিক্ষা হচ্ছে যে, ঈশ্বর ভালবাসা। অদৃশ ঈশ্বরের সেই ভালবাসা মূর্ত হয়েছে যীশুর মধ্যে, "যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকে দেখেছে"। যীশুকে ঈশ্বরপুত্র বলে বিশ্বাস করা, কেননা তিনিই প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা, যিনি মানবজাতিকে পাপ থেকে পরিত্রাণ করার জন্য মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। খ্রীষ্টান হওয়ার অর্থ হচ্ছে যীশুকে ব্যক্তিগত মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করা। এই বিশ্বাসেই পরিত্রাণ। বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে কারো উপর আস্থা স্থাপন করা। ঈশ্বরে বিশ্বাস হচ্ছে ঈশ্বরের উপর আস্থা স্থাপন করা, তাঁর মঙ্গলময়তার উপর আস্থা রাখা। "খ্রীষ্টধর্ম" বলতে কোন বিধি-বিধান মেনে চলা বা আচার-অনুষ্ঠান পালন করা বুঝায় না; পক্ষান্ড়রে একজন জীবিত ব্যক্তিকে অনুসরণ করা বুঝায়। মৌলিক খ্রীষ্টিয় সেবাকাজ বলতে বুঝায় পাপে পতিত মানবজাতিকে উদ্ধার করার সেই সুখবর সহভাগিতা করা। খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস বলতে বুঝায় যীশুর সাথে একাত্ম হয়ে ঈশ্বরের উপর ব্যক্তিগত বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে ও তাঁর উপর আস্থা রেখে দৈনন্দিন জীবন যাপন করা।

মনে রাখুন

যে তার ভাইকে ভালবাসে না সে অন্ধকারেই পড়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঈশ্বর সম্বন্ধে মূল শিক্ষা কি?

(ক) ঈশ্বর সর্বশক্তিমান
(খ) ঈশ্বর ভালবাসা
(গ) ঈশ্বর সর্বব্যাপী
(ঘ) ঈশ্বর ন্যায়বান

২। যীশুর কথা অনুযায়ী আমাদের প্রতিবেশী কে?

(ক) স্ব-ধর্মের লোকজন
(খ) নিকটাত্মীয়রা
(গ) নিজ পাড়া বা গ্রামের লোকজন
(ঘ) যে ব্যক্তি মানুষের বিপদে সাড়া দেয়

৩। খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী যীশু কে?

(ক) একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব
(খ) একজন সমাজ-সংস্কারক
(গ) একজন ধর্মসাধক
(ঘ) একটি জীবন্ত পথ

৪। প্রথম খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ নিজেদেরকে কী বলে পরিচয় দিতেন?

(ক) একটি বিশেষ পথের অনুসারী বলে
(খ) একটি দার্শনিক মতবাদের অনুসারী বলে
(গ) একজন খ্যাতিমান সাধকের অনুসারী বলে
(ঘ) একটি ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদের অনুসারী বলে

পাঠ-৪ : শ্রেষ্ঠ বিধান ও নতুন আদেশ (যোহন ১৩:১–১৭, ৩৪–৩৫; ১করি ১৩:১-৭, ১৩)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অন্তিম ভোজের সময় যীশু কিভাবে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যীশুর দেওয়া নতুন আদেশটি কী তা বলতে পারবেন।
- বাস্তব জীবনে ভালবাসার আদর্শ পালনের দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

(ক) তখন নিস্তার-পর্ব সুরু হবে। যীশুর তো জানাই ছিল যে, এবার তাঁর সেই সময়টি এসে গেছে, যখন এই জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে তাঁকে চলে যেতে হবে। এই সংসারে রয়েছে যারা, তাঁর সেই আপনজনদের তিনি তো বরাবরই ভালবেসে এসেছেন। এবার তিনি কিন্তু তাদের প্রতি তাঁর সেই ভালবাসার চূড়ান্ড় প্রমাণ দিলেন।

সান্ধ্যভোজ তখন চলছে। শয়তান ইতিমধ্যেই সিমোনের ছেলে যুদা ইস্কারিয়োতের মনে যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেবার সঙ্কল্প জাগিয়ে দিয়েছিল। তবে যীশু ভালভাবেই জানতেন, পিতা তাঁরই হাতে সমস্ত-কিছু তুলে দিয়েছেন। এ-ও তিনি জানতেন যে, ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছেন তিনি আর ঈশ্বরের কাছেই ফিরে যাচ্ছেন। তিনি তখন খাওয়ার আসন থেকে উঠে গায়ের জামাটা খুলে রাখলেন এবং একটা গামছা নিয়ে কোমরে জড়ালেন। তারপর একটা পাত্রে জল ঢেলে তিনি শিষ্যদের পা ধুয়ে দিতে আরম্ভ করলেন আর কোমরের গামছাটা দিয়ে তা মুছিয়ে দিতে লাগলেন। এই ভাবে তিনি সিমোন পিতরের কাছে এলেন। কিন্তু পিতর তাঁকে বললেন : "সে কি প্রভু, আপনি আমার পা ধুয়ে দেবেন?" যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন : "আমি কী করছি, এখন অবশ্য তা বুঝতে পারছ না, কিন্তু পরে বুঝতে পারবে।" পিতর তাঁকে বললেন : "না, আমার পা আপনি ধুয়ে দেবেন না, কক্ষনো না!" যীশু উত্তর দিলেন : "আমি যদি ধুয়ে না দিই, তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্কই যে থাকে না!" সিমোন পিতর তাঁকে বললেন : "প্রভু, তাহলে শুধু পা নয়, আমার হাত আর মাথাও আপনি ধুয়ে দিন!" যীশু তাঁকে বললেন : "স্নোন করেছে, শুধু পা ছাড়া তার আর কিছু ধোবার প্রয়োজন নেই; সর্বাঙ্গেই সে শুচি। তোমরাও তো শুচি ... কিন্তু সকলে নও!" তিনি অবশ্য জানতেন, কে তাঁকে শত্রুর হাতে তুরে দেবে; তাই তিনি বললেন : "তোমরা সকলে শুচি নও!"

তাঁদের পা ধুয়ে দেওয়ার পর তিনি গায়ের জামাটা পরে নিয়ে আবার খাওয়ার আসনে গিয়ে বসলেন। তখন তিনি তাঁদের বললেন : "আমি এখন তোমাদের জন্যে কী করলাম, তোমরা কি তা বুঝতে পারছ? তোমরা তো আমাকে 'গুরু' বা 'প্রভু' বলে থাক – আর ঠিকই বল, আমি তো সত্যিই তাই। কাজেই প্রভু ও গুর" হয়ে আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত। আমি তো এখন তোমাদের সামনে একটি আদর্শই তুলে ধরলাম; আমি তোমাদের জন্যে যেমনটি করলাম, আমি চাই, তোমরাও ঠিক তেমনটি করবে! আমি তোমাদের সত্যি-সত্যিই বলছি, দাস কখনো তার প্রভুর চেয়ে বড় হয় না; তেমনি যে-লোক কোথাও প্রেরিত, সেও কখনো তাঁর চেয়ে বড় হয় না যিনি তাকে প্রেরণ করেছেন। এই কথা জেনে তোমরা যদি সেইমতোই কাজ করে চল, তবে ধন্য তোমরা!

শোন, আমি এখন তোমাদের একটি নতুন আদেশ দিচ্ছি : তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমাদেরও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসতে হবে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ভালবাসা থাকে, তাহলে সকলে তাতেই বুঝতে পারবে, তোমরা আমার শিষ্য!"

(খ) আমি যদি মানুষদের ও স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলতে পারি, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতাল ছাড়া আর কিছুই নই! আর আমি যদি প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করতে পারি, যদি উপলব্ধি করতে পারি সমস্ত রহস্যাবৃত সত্য, জানতে পারি ধর্মজ্ঞানের সমস্ড় কথা, যদি আমার অন্তরে থাকে পর্বত সরিয়ে দেবার মতো পুর্ণ বিশ্বাস, অথচ না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি তো কিছুই নই! আর আমি যদি আমার সমস্ত-কিছুই দীনদরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিই, এমন কি আমার নিজের দেহ-ও আগুনে সঁপে দিই, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালবাসা, তাহলে তাতে আমার কোন লাভই নেই! ...

কেননা "ভালবাসা নিত্য-সহিষ্ণু, ভালবাসা স্নেহ-কোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজীও নয়। পরের অপরাধ সে কখনো ধরেই না। অধর্মে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে; তার বিশ্বাস সীমাহীন, সীমাহীন তার আশা ও তার ধৈর্য। ....

আপাতত বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা, এই তিনটিই থেকে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ভালবাসা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ"

সারসংক্ষেপ : ঈশ্বর তো ভালবেসে অনেক মর্যাদা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে। সেই মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করে, তাঁর অবাধ্য হয়ে পাপ করলেও ঈশ্বর তাকে পরিত্যাগ করেননি। কেননা ঈশ্বর তো ঈশ্বর, তাঁর ভালবাসা চিরস্থায়ী। তিনি প্রতিশোধপরায়ণ নন। "ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করে দিয়েছেন, যাতে, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, তাদের কার-ও যেন বিনাশ না হয়, বরং তারা সকলেই যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন। ঈশ্বর জগৎকে দন্ডিত করতে তাঁর পুত্রকে এই জগতে পাঠাননি; পাঠিয়েছিলেন, যাতে তাঁর মাধ্যমে জগৎ পরিত্রাণ লাভ করে। যে-মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে, সেই মানুষকে কখনো বিচারে দন্ডিত হতে হয় না; কিন্তু তাঁকে যে অবিশ্বাস করে, সে তো বিচারে দন্ডিত হয়েই আছে, কারণ ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের প্রতি সে যে বিশ্বাস রাখেনি! সেই বিচার এই মর্মেই করা হয়েছে যে, আলো জগতে আসা সত্ত্বেও মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকেই ভালবেসেছে, যেহেতু মানুষের কাজকর্ম অসৎ ছিল। কারণ যে-কেউ মন্দ কাজ করে, আলোকে সে ঘৃণা করে, আলোর দিকে সে আসেই না, পাছে তার কাজের আসল রূপটা বেরিয়ে পড়ে! কিন্তু যে-মানুষ সত্যের সাধক, সে তো আলোর দিকে এগিয়ে আসে, যাতে, তার কাজকর্ম যে ঈশ্বরের প্রেরণায় সাধিত, তা যেন স্পষ্টই প্রকাশ পায়" (যোহন ৩:১৬-২১)। কবি-লেখকরাও একই উপলব্ধি থেকে বলেছেন : "পেঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোন ছুতা, জান না সূর্যের সঙ্গে আমার শত্রুতা!"ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করলে ঈশ্বর তাঁর উপর কিছু চাপিয়ে দেন না।

যীশু মানুষকে ভালবেসে ক্রুশের উপরে স্বেচ্ছায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি নিজেই তো বলেছেন: "পিতা আমাকে এই জন্যেই ভালবাসেন যে, আমি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছি – পরে আমি অবশ্য তা আবার ধারণ করব! আমার কাছ থেকে কেউ তা হরণ করে নিচ্ছে না; আমি নিজে থেকেই তা বিসর্জন দিচ্ছি। তা বিসর্জন দেবার অধিকারও আমার আছে, আবার তা ধারণ করবার অধিকার আমার আছে। পিতার কাছ থেকে আমি এই আদেশ পেয়েছি" (যোহন ১০:১৭-১৮)।

সাধু পল বলেন : ভালবাসা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ গুণ। কেননা "ভালবাসা নিত্য-সহিষ্ণু, ভালবাসা স্নেহ-কোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজীও নয়। পরের অপরাধ সে কখনো ধরেই না। অধর্মে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে; তার বিশ্বাস সীমাহীন, সীমাহীন তার আশা ও তার ধৈর্য। ....আপাতত বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা, এই তিনটিই থেকে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ভালবাসা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ"। (১করি ১৩:১-১৩)।

মনে রাখুন

যীশু বলেন : "আমি তোমাদের একটি নতুন আদেশ দিচ্ছি : তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমাদেরও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসতে হবে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ভালবাসা থাকে, তাহলে সকলে তাতেই বুঝতে পারবে, তোমরা আমার শিষ্য!"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্রুশের উপরে যীশুর স্বেচ্ছায় জীবন দান কিসের প্রমাণ?

(ক) বীরত্বের প্রমাণ (খ) ভালবাসার প্রমাণ
(গ) কষ্ট ও ত্যাগস্বীকারের প্রমাণ (ঘ) উদারতার প্রমাণ

২। যীশুর শিষ্যত্বের পরিচয় কী?

(ক) পরস্পরের প্রতি ভালবাসা (খ) শিক্ষা বিস্তার
(গ) গরীবদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ (ঘ) পান্ডিত্যপূর্ণ ধর্মপ্রচার

৩। সাধু পলের কথা অনুসারে ভালবাসা হচ্ছে :

(ক) অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ (খ) শ্রেষ্ঠ গুণ
(গ) মানুষের মন জয় করার শক্তি (ঘ) শ্রেষ্ঠ চরিত্রের লক্ষণ

৪। জগতে আলো আসা সত্ত্বেও মানুষ অন্ধকারকেই ভালবাসে কেন?

(ক) কারণ সেখানেই তারা নিরাপদ বোধ করে (খ) কেননা তাদের কাজকর্ম অসৎ
(গ) কেননা তাদের ধরা পড়ার ভয় থাকে (ঘ) কেননা আলোকিত মানুষের দায়িত্ব বেশি

পাঠ-৫: ক্ষমাশীল পিতা, হারানো পুত্র ও কঠিন-হৃদয় ভাইয়ের উপমা-কাহিনী (লুক ১৫:১১–৩২)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অপব্যয়ী পুত্র ও দয়ালু পিতার কাহিনীটি বর্ণনা করতে পারবেন।
- পাপী মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার কথা বুঝাতে পারবেন।
- ঈশ্বরের ক্ষমাশীলতার কথা বলতে পারবেন।
- ভাইয়ে ভাইয়ে পুনর্মিলনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পিতামাতার প্রতি সম্ভ্রমের বাধ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

যীশু বললেন, "একটি লোকের দুটি ছেলে ছিল। ছোট ছেলেটি একদিন বাবাকে বলল: 'বাবা, আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিয়ে দাও'। তখন তিনি তাদের দু'জনের মধ্যে তাঁর ধনসম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। কিছুদিন পরে সেই ছোট ছেলেটি নিজের যা-কিছু ছিল, সবই বিক্রি করে সমস্ত টাকা-কড়ি নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। সেখানে উচ্ছৃঙ্খলের মতো দিন কাটিয়ে সে তার সর্বস্বই উড়িয়ে দিল।

সে সব-কিছুই খরচ করে ফেলেছে, এমন সময় সেই দেশে দেখা দিল করাল দুর্ভিক্ষ। ছেলেটির এবার দুর্দিন শুরু হল। তাই তাকে গিয়ে চাকরের কাজ নিতে হল সেখানকার এক অধিবাসীর কাছে; সেই লোকটি তাকে নিজের জমিতে পাঠিয়ে দিল শুয়োর চরাতে। ছেলেটির খুব ইচ্ছা হতো, শুয়োরেরা যে-শুঁটি খায়, তা-ই খেয়ে সে তার পেট ভরাবে। কিন্তু তাও তাকে কেউ দিত না। তখন তার চেতনা হল। সে বলল: "বাবার ওখানে কত মাইনে-করা লোক প্রয়োজনের চেয়েও বেশি খাবার পাচ্ছে আর আমি কিনা এখানে খিদের জ্বালায় মরছি! আমি এবার এই জায়গা ছেড়ে বাবার কাছে যাব আর তাঁকে বলব: 'বাবা, আমি ঈশ্বরের কাছে আর তোমার কাছে পাপ করেছি। আমি আর তোমার ছেলে বলে পরিচিত হবার যোগ্য নই! তাই তুমি আমাকে তোমার একজন মাইনে-করা লোকের মতোই রাখ।' সে তখন সেই জায়গা ছেলে তার বাবার কাছে যাবার জন্যে রওনা হল।

সে তখনও দূরেই রয়েছে, সেই সময়ে তার বাবা তাকে দেখতে পেলেন। তাঁর প্রাণটা কেঁদে উঠল। ছুটে গিয়ে তিনি ছেলেটির গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেলেন। তখন ছেলেটি তাঁকে বলল : 'বাবা, আমি ঈশ্বরের কাছে আর তোমার কাছে পাপ করেছি। আমি আর তোমার ছেলে বলে পরিচিত হবার যোগ্য নই! তাই তুমি আমাকে তোমার একজন মাইনে-করা লোকের মতোই রাখ!' তার বাবা কিন্তু চাকরদের ডেকে বললেন : 'শীগগির যাও : সবচেয়ে ভাল পোশাক বের করে আন আর ওকে পরিয়ে দাও। ওর হাতে একটা আংটি দাও আর পায়ে পরিয়ে দাও জুতো। তারপর সেই মোটাসোটা বাছুরটা নিয়ে এসে কেটে ফেল। তারপর এসো, খেয়ে-দেয়ে আনন্দ করা যাক! কারণ আমার এই যে-ছেলেটি, সে তো মরেই গিয়েছিল আর এখন বেঁচে উঠেছে; সে হারিয়ে গিয়েছিল আর এখন তাকে পাওয়া গেছে!' তাই তারা সকলে আনন্দ করতে লাগল।

বড় ছেলেটি তখন মাঠে ছিল। ফেরার পথে সে যখন বাড়ির কাছে পৌঁছল, তখন নাচ ও গানবাজনার শব্দ তার কানে এল। সে একজন চাকরকে ডেকে জিজ্ঞেস করল : 'এসব আবার কী হচ্ছে?' চাকরটি বলল: 'আপনার ভাই যে ফিরে এসেছেন! আর আপনার বাবা মোটাসোটা সেই বাছুরটাকে তাই কেটে ফেলেছেন। তিনি যে তাঁকে সুস্থ দেহেই ফিরে পেয়েছেন!' এই কথা শুনে বড় ছেলেটি রেগে গেল। সে ভেতরে যেতে চাইল না। তার বাবা বাইরে এসে তাকে সাধাসাধি করতে লাগলেন। কিন্তু বাবাকে সে উত্তর দিল : 'ভেবে দেখ তো, এত বছর ধরে আমি দাসের মতো তোমার জন্যে খেটে আসছি, একদিনও তোমার কথা অমান্য করিনি; অথচ তুমি তো আমাকে একটা ছাগলছানাও কখনো দাওনি, যাতে আমি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে আনন্দ করতে পারি! কিন্তু তোমার ওই যে-ছেলে – যে বেশ্যাদের পেছনে তোমার ধনসম্পত্তি নষ্ট করেছে – সে যখন ফিরে এল, তুমি কিনা তারই জন্যে মোটাসোটা সেই বাছুরটাকে কেটে ফেললে!...'

তিনি তখন বললেন : 'বাবা, তুমি তো সবসময়েই আমার কাছে রয়েছ আর আমার সব-কিছুই তো তোমারই! কিন্তু তবুও আনন্দ করা, উৎসব করাই উচিত ছিল, কারণ তোমার এই যে-ভাই, সে তো মরেই গিয়েছিল আর এখন বেঁচে উঠেছে; সে হারিয়ে গিয়েছিল আর এখন তাকে পাওয়া গেছে!'..."

সারসংক্ষেপ : পাপ করে মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল (আদি ৩:১-১৩)। ফলে মানুষের পরস্পরের মধ্যেও সম্প্রীতি হারিয়ে গিয়েছিল। সেই হারানো সদ্ভাব ফিরিয়ে আনার জন্য, ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষে-মানুষে পুনর্মিলন সাধনের জন্যই যীশুর জন্ম এবং ক্রুশীয় মৃত্যু। তিনি তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর দ্বারা মানুষকে সেই পাপ-বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। যীশুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সাথে মানুষের এবং মানুষের পরস্পরের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটে। সাধু পল বলেন, "আমরা যখন ঈশ্বরের শত্রু ছিলাম, তখনই তো তাঁর পুত্রের মৃত্যু বরণের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছি; তাহলে তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত এই যে আমরা, আমরা যে একদিন তাঁর পুত্রের জীবনীশক্তিতে পরিত্রাণ লাভ করব, তা আরও কতই না সুনিশ্চিত! (রোমীয় ৫:১০)। "এই সব-কিছু ঈশ্বরেরই কাজ : তিনিই খ্রীষ্টের মধ্যস্থতায় নিজের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন, এবং সেই পুনর্মিলনের কর্মদায়িত্ব তিনি আমাদের হাতেই তুলে দিয়েছেন" (২করি ৫:১৮)। "স্বয়ং খ্রীষ্টই তো আমাদের মধ্যে শান্তি বন্ধন; .....ইহুদী-অনিহুদী ... তাদের উভয় পক্ষকে তিনি একই দেহের আশ্রয়ে এক করে নিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করবেন তার ক্রুশমৃত্যুরই মধ্য দিয়ে। নিজে মৃত্যু বরণ করেই তো সেই শত্রুতার অবসান ঘটাবেন তিনি। .. আজ তাঁকেই পথ করে ইহুদী-অনিহুদী আমরা তো সকলেই এই পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় এক হয়ে পরম পিতার দিকে যেতে পারি" (এফেসীয় ২:১৫-১৮)।

মনে রাখুন

"তবুও আনন্দ করা, উৎসব করাই উচিত ছিল, কারণ তোমার এই যে-ভাই, সে তো মরেই গিয়েছিল আর এখন বেঁচে উঠেছে; সে হারিয়ে গিয়েছিল আর এখন তাকে পাওয়া গেছে!"

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পাপ করলে কী হয়?

(ক) মনে ভয় জন্মে
(খ) মানসিক রোগ হয়
(গ) শারীরিক অসুখ হয়
(ঘ) ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়

২। যীশু কিভাবে মানুষের মধ্যে শত্রুতার অবসান ঘটিয়েছেন?

(ক) প্রচার কাজের মধ্য দিয়ে
(খ) মৃত্যু বরণ করে
(গ) অলৌকিক কাজ করে
(ঘ) যাদুমন্ত্র দিয়ে

৩। ছোট ছেলেটি তার বাবার কাছে ফিরে এসে কী বলেছিল?

(ক) আমি ঈশ্বরের কাছে ও তোমার কাছে পাপ করেছি
(খ) আমি টাকা-পয়সা অপচয় করেছি
(গ) আমি খিদের জ্বালা মরছি
(ঘ) আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি

৪। বড় ছেলেটি তার ছোট ভাইয়ের প্রত্যাবর্তনের আনন্দে যোগ দিতে পারেনি কেন?

(ক) কারণ সে ছিল বদমেজাজী
(খ) কারণ সম্পত্তির উপর তার লোভ ছিল বেশি
(গ) সে তার পিতার ক্ষমাশীল ভালবাসা বুঝতে পারেনি
(ঘ) সে তার সম্পত্তি হারাতে চায়নি

পাঠ-৬: ধর্মের অনুশীলন :ভ্রাতৃপ্রেমই অন্তিম বিচারের মানদন্ড (মথি ২৫:৩১-৪৬)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ধর্মের প্রকৃত অনুশীলন কীভাবে হয় তা বোঝাতে পারবেন।
- পরার্থপর নিষ্কাম ভালবাসাই যে অন্তিম বিচারের মানদন্ড তা বলতে পারবেন।
- প্রকৃত ভালবাসাই যে ঈশ্বরকে লাভ করার উপায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মৃত্যুর পর অনন্ত সুখ বা অনন্ত শাস্তির বিষয় বোঝাতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

মানবপুত্র যখন আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে আসবে – আর তার সঙ্গে আসবে সমস্ত স্বর্গদূত – সে তখন নিজের গৌরবের সিংহাসনে এসে বসবে এবং তার সামনে তখন সকল জাতির মানুষদের সমবেত করা হবে। মেষপালক যেমন ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে নেয়, তেমনি সেও মানুষ থেকে মানুষকে পৃথক করে নেবে। মেষগুলিকে সে রাখবে তার ডান পাশে, আর ছাগগুলিকে বাঁ পাশে। তারপর ডান পাশে যারা আছে, এই রাজা তাদের বলবে : 'এসো তোমরা, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যারা! জগতের সৃষ্টির সময় থেকে যে-রাজ্য তোমাদের দেওয়া হবে বলে রাখা আছে, তা এবার তোমরা নিজেদেরই বলে গ্রহণ কর। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে জল দিয়েছিলে; বিদেশী ছিলাম দিয়েছিলে আশ্রয়; ছিলাম বস্ত্রহীন, তোমরা আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; আমি পীড়িত ছিলাম, তোমরা আমার যত্ন নিয়েছিলে; ছিলাম কারারুদ্ধ আর তোমরা আমাকে দেখতে এসেছিলে।' তখন ধার্মিকেরা উত্তরে তাকে বলবে :'প্রভু, কখন্ আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, কিংবা তৃষ্ণার্ত দেখে জল দিয়েছিলাম? কখন্ আপনাকে বিদেশী দেখে দিয়েছিলাম আশ্রয়, কিংবা বস্ত্রহীন দেখে পরিয়েছিলাম পোশাক? কখনই বা আপনাকে পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম?' রাজা তখন তাদের এই উত্তর দেবে : 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা-কিছু করেছ, তা আমারই জন্যে করেছ।'

তারপর যারা তার বাঁ পাশে আছে, সে তাদের বলবে, : 'আমার সামনে থেকে দূর হও তোমরা, অভিশাপের পাত্র যারা! শয়তান ও তার দলের যত অপদূতদের জন্যে যে শাশ্বত আগুন প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, তোমরা সেই আগুনেই যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, আমাকে জল দাওনি; বিদেশী ছিলাম, তোমরা আশ্রয় দাওনি; ছিলাম বস্ত্রহীন, তোমরা আমাকে পোশাক পরাওনি! পীড়িত ও কারারুদ্ধ ছিলাম, আর তোমরা আমার যত্ন নাওনি। তখন উত্তরে তারাও বলবে : 'প্রভু, কখন্ আমরা আপনাকে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত, বিদেশী বা বস্ত্রহীন, পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখেও আপনার সেবা করিনি?' তখন সে তাদের এই উত্তর দেবে : 'আমি তোমাদের সত্যি-ই বলছি, এই তুচ্ছতম মানুষদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা-কিছু করোনি, তা আমারই জন্যে করোনি।' তখন এরা যাবে শাশ্বত দন্ডলোকে আর ধার্মিকেরা যাবে শাশ্বত জীবনলোকে।"

সারসংক্ষেপ : প্রতিটি মানুষের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছেন ঈশ্বরকে পাওয়া। আর ঈশ্বরকে পাওয়ার অর্থ হচ্ছে – ইহজগতে ও পরজগতে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করা। কেবলমাত্র জীবনের শেষপ্রান্তে নয় বরং যাত্রাপথের সমগ্র বাস্তবতায়ই তাঁকে 'ইম্মানুয়েল' (অর্থাৎ আমাদের সঙ্গী ঈশ্বর) হিসেবে উপলব্ধি করা। জীবনের এই লক্ষ্যের দিকে চলার জন্য পথের প্রয়োজন। সেই পথটির নামই ধর্ম। সংক্ষেপে বলা যায়, লক্ষ্যের দিকে যাত্রাপথটিই হচ্ছে ধর্ম, অর্থাৎ যা-কিছু মানুষকে সঠিক পথে ধরে রাখে তারই নাম ধর্ম। আর খ্রীষ্টের বিধান অনুযায়ী সঠিক পথ হচ্ছে ভালবাসা, সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথ। যিনি দৈনন্দিন জীবনে একাগ্রচিত্তে কায়মনোবাক্যে এগুলোর সন্ধান করেন, এগুলো অনুশীলন করেন তিনিই ধার্মিক। প্রকৃত বিশ্বাসীদের জীবনে ধর্মের অনুশীলন বা ধর্মপালন প্রকাশ পায় তাদের কর্মে। প্রেরিতদূত যাকোব বলেন : সৎকর্মহীন বিশ্বাস সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ। "ভাই, কেউ যদি দাবি করে যে, ঈশ্বরে তার বিশ্বাস আছে, অথচ সে যদি সেইমতো কোন সৎকর্ম না ক'রে থাকে, তাহলে কীই বা লাভ তাতে? তেমন বিশ্বাস কি তাকে পরিত্রাণ করতে পারবে? ... বিশ্বাসও ঠিক তেমনি : সৎকর্ম ছাড়া তা সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ!" (যাকোব ২:১৪-১৭)। জগতের শেষদিনে খ্রীষ্টরাজা মানুষের বিচার করবেন এই সৎকর্মের মানদন্ড দিয়ে। মানুষের জীবনে প্রকৃত সৎকর্মের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে অকপট, নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ, পরার্থপর ভালবাসার মাধ্যমে। প্রতিদানে কোন কিছুর আশা না করে দরিদ্র, অসহায়, দুর্বল, বিপন্ন মানুষের সেবার মধ্য দিয়ে। মানুষের প্রশংসা বা স্বীকৃতির তোয়াক্কা না করে, নিজের প্রতি অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, নিজের স্বার্থ চিন্তা না করে অকৃত্রিম ভালবাসাই মানুষকে প্রকৃত মানুষ করে তোলে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এরূপ ভালবাসাই তাঁর সান্নিধ্য লাভের উপায়।

মনে রাখুন

"আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা-কিছু করেছ, তা আমারই জন্যে করেছ!"

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রেরিতদূত যাকোবের কথা অনুসারে :

(ক) সৎকর্মহীন বিশ্বাস সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ
(খ) বিশ্বাসেই পরিত্রাণ, কাজ নিষ্প্রয়োজন
(গ) সৎকর্মই যথেষ্ট, বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই
(ঘ) বিশ্বাসই সৎকর্মের প্রমাণ

২। মানুষের অন্তিম বিচারের মানদন্ড কী?

(ক) অপরের ক্ষতি না-করা
(খ) অগাধ পান্ডিত্য ও ঐশজ্ঞান অর্জন করা
(গ) দীনদরিদ্র ও অসহায় মানুষের প্রতি কার্যকর ভালবাসা
(ঘ) ব্যাপক দারিদ্রবিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ করা

৩। মানুষের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য কী?

(ক) মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ লাভ করা
(খ) ইহজগতে ও পরজগতে ঈশ্বরকে পাওয়া
(গ) ঈশ্বর ও মানুষকে সেবা করা
(ঘ) শিশুর মতো সরল হয়ে জীবন যাপন করা

৪। শেষবিচারের দিনে মানবপুত্র কী করবে?

(ক) মানুষ থেকে মানুষদের পৃথক করবে
(খ) ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করবে
(গ) সাদা ও কালো মানুষদের পৃথক করবে
(ঘ) ধনী ও গরিব মানুষদের পৃথক করবে

পাঠ-৭ : বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম চর্চা ও অনুসারী (প্রেরিতদের কার্যাবলী ২:৪২-৪৭; ৪:৩২-৩৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও বিস্তার সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টানদের দ্বারা পরিচালিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রীষ্টানদের অবদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

স্বর্গারোহণের আগে পুনরুত্থিত যীশু তাঁর এগারোজন প্রেরিতদূতদের আদেশ দিয়ে বললেন: "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার! যে বিশ্বাস করবে আর দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে। যে বিশ্বাস করবে না, সে কিন্তু শাস্তিই পাবে। যারা বিশ্বাস করবে, তাদের সমর্থনে তখন ঘটতে থাকবে এই সব অলৌকিক ঘটনা : তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, তারা নতুন-নতুন ভাষায় কথা বলবে, তারা হাতে ক'রে সাপ তুলবে আর মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না। তারা রোগীদের উপর হাত রাখলেই রোগীরা ভাল হয়ে উঠবে" (মার্ক ১৬:১৫-১৮)। এই আদেশ পালন করতে করতেই খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ বিশ্বের সবত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

খ্রীষ্টমন্ডলীর ইতিহাস সুদীর্ঘ দুই হাজার বছর পুরনো। এশিয়া মহাদেশের মধ্যপ্রাচ্যে এর উদ্ভব হলেও প্রথম দিকে এর অপেক্ষাকৃত অধিক বিস্তৃতি ঘটে ইউরোপ মহাদেশে। অতঃপর ইউরোপ হতে অন্যান্য মহাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। ইসলাম ধর্মের ন্যায় খ্রীষ্টধর্মও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচারিত হয়েছিল মিশনারীদের দ্বারা। কথিত আছে যে, যীশুর বারোজন প্রেরিতদূতের মধ্যে দু'জন - সাধু টমাস এবং বার্থালোমেয় - দক্ষিণ এশিয়ায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতেই। তবে পাক-ভারত উপমহাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল হতে বিস্তার লাভ করতে করতে বর্তমান বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্মের বিস্ড়ার ঘটতে শুরু করে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে - পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক কর্মকান্ড বিস্ড়ারের সাথে সাথে। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে পর্তুগীজরা ব্যাপকভাবে ভারতে বাণিজ্য করতে আসে এবং তাদের সাথে সাথে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ আসেন। ইউরোপের পর্তুগাল দেশ থেকে তারা আসতেন বলে তাদের বলা হতো পর্তুগীজ।

বাংলাদেশে খ্রীষ্টানদের কয়েকটি মন্ডলী বা চার্চ গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে কাথলিক ও প্রোটেষ্টান্ট। খ্রীষ্টান চার্চের মধ্যে কাথলিক মন্ডলীই সবচেয়ে পুরনো এবং জনসংখ্যার বিচারে তারা দুই-তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য মন্ডলীর খ্রীষ্টানদের জনসংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ। বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বমোট ৬টি কাথলিক ধর্মপ্রদেশ আছে, যথা: ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ, খুলনা ধর্মপ্রদেশ, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ ও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। প্রতিটি ধর্মপ্রদেশের প্রধান হলেন ধর্মপাল বা বিশপ। প্রতিটি ধর্মপ্রদেশে রয়েছে কয়েকটি ধর্মপল্লী বা প্যারিশ। বর্তমানে বাংলাদেশে কাথলিক মন্ডলীর রয়েছে প্রায় ৮০টি ধর্মপল্লী। প্রত্যেক ধর্মপল-ীতে পালকীয় দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন এক বা একাধিক যাজক/পুরোহিত। আর প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে যারা পালকীয় পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত থাকেন তাদেরকে বলা হয় পাস্টর বা পালক। কাথলিক মন্ডলীর সেবাকর্মীদের মধ্যে রয়েছেন যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ব্রাদার ও সিষ্টার, ধর্মপ্রচারক, শিক্ষক, সমাজকর্মী, স্বাস্থ্যকর্মী ইত্যাদি। কাথলিকদের পরেই বাংলাদেশে প্রোটেষ্টান্ট মিশনারীরা প্রচার কাজ শুরু করেন আজ থেকে দুই শত বছর আগে। বাংলাদেশে প্রোটেষ্টান্ট চার্চ বা মন্ডলীগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে এ্যাংলিকান ও ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলী। ড. উইলিয়াম কেরী দিনাজপুরে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাপ্টিষ্ট গীর্জাঘর স্থাপন করেন ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাইবেল অনুবাদ করা হয়। বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারায় ড. উইলিয়াম কেরীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশী খ্রীষ্টান জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই আদিবাসী/উপজাতি। বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় প্রধান খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠী হচ্ছে মান্দী বা গারো, দিনাজপুর-রাজশাহী-রংপুর এলকায় সান্তাল ও ওঁরাও, সিলেট অঞ্চলে খাসিয়া, রাঙ্গামাটি-বান্দরবন এলাকায় চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ইত্যাদি।

ফল দিয়ে যেমন বৃক্ষের পরিচয়, তেমনি কাজ দিয়ে মানুষ ও তার ধর্মবিশ্বাসের আসল পরিচয়। খ্রীষ্টধর্মের মূল শিক্ষা হচ্ছে ভালোবাসা : (১) ঈশ্বরকে সমস্ত মনপ্রাণ ও শক্তি দিয়ে ভালোবাসা এবং (২) প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসা। সৃষ্টিকর্তার আনুষ্ঠানিক পূজা-আরাধনা ছাড়াও বাস্তব জীবনে ধর্মবিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সেবায়। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের তথা মন্ডলীর পরিচয় ফুটে ওঠে তাদের জীবনযাত্রায় ও সেবাকাজে। আপাতঃদৃষ্টিতে যাকে নিছক দাতব্য বা সমাজকল্যাণমূলক কাজ বলে মনে হয়, খ্রীষ্টিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তা-ই ধর্মবিশ্বাসের বাস্তবায়ন ও বহিঃপ্রকাশ।

বাংলাদেশে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য খ্রীষ্টমন্ডলীগুলো যেসব সেবাকাজে নিয়োজিত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা, মানবিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচন। এসব কাজের মধ্য দিয়ে মন্ডলীগুলো খ্রীষ্টিয় সাক্ষ্য বহন করে চলছে।

১। শিক্ষা

শিক্ষাবিস্তার মন্ডলীর অন্যতম প্রধান সেবাকাজ। বাংলাদেশে খ্রীষ্টমন্ডলী প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হযেছে। সংখ্যার দিক দিয়ে স্বল্প হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশ মন্ডলী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। জনগণের মাঝে শিক্ষাবিস্ত্মারের জন্য কাথলিক মন্ডলী উল্লেখযোগ্য যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে তার মধ্যে রয়েছে ঢাকা শহরে ৪টি কলেজ যথা: নটর ডেম কলেজ (১৯৪৯), হলিক্রস কলেজ (১৯৫০), সেন্ট যোসেফ স্কুল (১৯৫৪) ও কলেজ (২০০২) এবং আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (২০০৯)। এ ছাড়া বিভিন্ন জেলায় প্রায় ৫০টি হাইস্কুল, ১০টির মতো জুনিয়র হাইস্কুল এবং ৫৫০টির মতো প্রাথমিক বিদ্যালয়। এছাড়া রয়েছে বেশ কিছু বয়স্ক-শিক্ষা কেন্দ্র ও লিটারেসী প্রকল্প। এ ছাড়া এ্যাংলিকান ও ব্যাপ্টিষ্ট মন্ডলীরও বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঢাকার ওয়াই ডবিউ সি এ হাইস্কুল ও কলেজ, বরিশালের অক্সফোর্ড মিশন স্কুল, বরিশাল ব্যাপ্টিষ্ট মিশন স্কুল, লালমনিরহাট ব্যাপ্টিষ্ট মিশন স্কুল, এ জি চার্চ স্কুল, ইত্যাদি।

স্কুল-কলেজ ছাড়াও কারিগরী ও পেশাভিত্তিক শিক্ষার জন্য রয়েছে বেশ কয়েকটি কারিগরী বিদ্যালয় ও মহিলাদের জন্য সেলাই সেন্টার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি রয়েছে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য হোস্টেল, বয়েজ হোম, এতিমখানা, শিশুভবন, ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানের বাইরে যুবক-যুবতী ও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ও গঠনের জন্য রয়েছে বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন যুবসেবাদল, ওয়াই সি এস, আই এম সি এস, ওয়াই এম সি এ, খ্রীষ্টান ছাত্র সংগঠন, কাথলিক নার্সেস গীল্ড, ইত্যাদি।

২। রুগ্ণ-পীড়িতদের সেবা

রুগ্ণ-পীড়িতদের সেবাদানের জন্য বিভিন্ন খ্রীষ্টান অধ্যুষিত এলাকায় নির্মিত হয়েছে হাসপাতাল, ডিসপেনসারী, শিশুসদন, মাতৃসদন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র, কুষ্ঠাশ্রম ইত্যাদি। এদের মধ্যে মালুমঘাট মেমোরিয়াল খ্রীষ্টান হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা ব্যাপ্টিষ্ট হাসপাতাল, যশোহরে ফাতিমা হাসপাতাল, তুমিলিয়া সেন্ট মেরীজ কাথলিক মাতৃসেবা কেন্দ্র, বারোমারী ও জলছত্র মিশনে হাসপাতাল ও কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধ প্রকল্প, রাজশাহীতে মিশন হাসপাতাল, ধানজুরী কুষ্ঠরোগীদের হাসপাতাল, দিনাজপুর সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতাল, শেলাবুনিয়া সেন্ট পল হাসপাতাল, পঙ্গু পুনর্বাসন প্রকল্প, তেজগাঁও মাদার তেরেজার হোম অব কমপেশন ইত্যাদি। এসব সেবাকাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে – দুর্বল-অসহায়, রুগ্ন-পীড়িত ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে খ্রীষ্টকে দেখা, ভালোবাসা ও তাদের যত্ন নেওয়া।

৩। দরিদ্রসেবা ও সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজ

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হাসপাতাল, কুষ্ঠাশ্রম, স্কুল, অন্ধ স্কুল প্রভৃতি সেবা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা। এসব সেবাকাজের লক্ষ্য হচ্ছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়ন। তবে যীশুর নীতি অনুসরণ করে দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিতদের মাঝেই এসব কাজ হয় বেশি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য রয়েছে সমবায় ও ঋণদান সমিতি, হাউজিং সোসাইটি, কারিতাস বাংলাদেশ, সি.সি.ডি.বি., ওয়াই ডব্লিউ সি এ, জাগরণী, কোর দ্যা জুট ওয়ার্কস, ওয়ার্ল্ড ভিশন, সেন্ট ভিন্‌সেন্ট দ্যা পল সমিতি ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে দারিদ্রবিমোচন ও জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

সারসংক্ষেপ : "প্রেরিতদূতেরা যা-কিছু উপদেশ দিতেন, সকলে তা নিষ্ঠার সঙ্গেই শুনত; তারা মিলেমিশেই জীবন যাপন করত এবং নিয়মিত ভাবেই রুটি-ছেঁড়ার অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনাসভায় যোগ দিত। সেখানকার প্রতিটি মানুষের মনে কেমন যেন একটা ভয়-বিস্ময় জেগে উঠতে লাগল, কেন না প্রেরিতদূতেরা সেই সময় বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটাচ্ছিলেন, বহু ঐশ নিদর্শন দেখাচ্ছিলেন। খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা তো সকলেই ঐক্যবদ্ধ ছিল; তাদের সব-কিছুই ছিল সকলের সম্পত্তি। তারা নিজেদের বিষয়সম্পদ বিক্রি ক'রে যা পেত, তা সকলের মধ্যে প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারেই ভাগ ক'রে দিত। দিনের পর দিন তারা একপ্রাণ হয়ে নিয়মিত ভাবেই মন্দিরে যেত এবং তাদের ঘরে র"টি-ছেঁড়ার অনুষ্ঠানও করত; তারা আন্ড়রিক আনন্দ ও সরলতার সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত। নিত্যই ঈশ্বরের বন্দনা করত তারা; সকলেই তাদের ভালবাসত। প্রভু পরিত্রাণে পথে যাদের নিয়ে আসছিলেন, তাঁরই প্রেরণায় তেমন সব মানুষ দিনের পর দিন এসে শিষ্যদলে যোগ দিচ্ছিল।"
"খ্রীষ্টবিশ্বাসী সমাজের সবাই ছিল একমন একপ্রাণ। তাদের কেউই নিজের কোন সম্পত্তি নিজের ব'লে দাবি করত না; সব-কিছুই ছিল সকলের সম্পত্তি। প্রেরিতদূতেরা মহাশক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে প্রভু যীশুর পুনরুত্থানের বিষয়ে তাঁদের সাক্ষ্যবাণী প্রচার করতেন। তাঁরা সবাই ছিলেন ঈশ্বরের খুবই অনুগ্রহধন্য মানুষ। ধর্মভাইদের মধ্যে কেউই অভাবে দিন কাটাতো না;

কারণ তাদের মধ্যে জমির কিংবা বাড়ির যারা মালিক ছিল, তারা তা বিক্রি করে দিত; বিক্রি ক'রে যে-টাকাটা পেত, তা নিয়ে এসে তারা প্রেরিতদূতদের পায়ের কাছে রেখে দিত; আর সেই টাকাটা প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুসারেই ভাগ ক'রে দেওয়া হতো।"

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যীশুর আদেশ অনুসারে জীবন যাপন করা ও পরিত্রাণের বাণী বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়াই হচ্ছে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের আহ্বান। দৈনন্দিন জীবনে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েই খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ তাদের কর্মজীবনে মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে জীবন নিবেদন করে থাকে।

মনে রাখুন

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যীশুর আদেশ অনুসারে জীবন যাপন করা ও পরিত্রাণের বাণী বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়াই হচ্ছে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের আহ্বান।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১৭.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাস্তব জীবনে ধর্মবিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে কিভাবে?

(ক) ধর্মশাস্ত্রে পান্ডিত্যের মাধ্যমে
(খ) মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সেবায়
(গ) যাগযজ্ঞ ও জপতপের মাধ্যমে
(ঘ) গরীবদের সাহায্যদানের মাধ্যমে

২। খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের আহ্বান কি?

(ক) যীশুর আদেশ অনুসারে জীবন যাপন করা
(খ) পরিত্রাণের বাণী বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া
(গ) যীশুর আদেশ অনুসারে জীবন যাপন করা ও পরিত্রাণের বাণী সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া
(ঘ) জনকল্যাণমূলক কাজ করা

৩। আপাতঃদৃষ্টিতে যাকে নিছক দাতব্য বা সমাজকল্যাণমূলক কাজ বলে মনে হয়, খ্রীষ্টিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই হচ্ছে -

(ক) মহা পুণ্যের কাজ
(খ) আসল ধর্মপ্রচার
(গ) ধর্মবিশ্বাসের বাস্তবায়ন ও বহিঃপ্রকাশ
(ঘ) ঈশ্বরের উপাসনা

৪। আদি খ্রীষ্টমন্ডলীর বিশ্বাসীদের জীবনযাত্রার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য কী ছিল?

(ক) সর্বত্র ধর্মপ্রচার করা
(খ) সেবামূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা
(গ) ব্যবসা-বাণিজ্য করা
(ঘ) একত্র মিলেমিশে জীবন যাপন ও প্রার্থনা করা

পাঠ-৮: আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপনে খ্রীষ্টধর্মের ভূমিকা (১করি ১৩:১–৭)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলতে পারবেন।
- আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কীভাবে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলা যায় তা বলতে পারবেন।
- নিজ ধর্মবিশ্বাসে নিষ্ঠাবান ও অপরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলায় খ্রীষ্টধর্মের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

দেহ, মন ও হৃদয়-আত্ন নিয়েই মানুষ। পূর্ণ-পরিণত মানুষ হওয়ার জন্য এগুলোর সমন্বিত বিকাশ প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ যদি তার নিজের মধ্যেই বিভক্ত থাকে তবে সে বিকশিত হতে পারে না। তেমনিভাবে কোন সমাজ যদি বিভক্ত থাকে তবে সেই সমাজও উন্নতি করতে পারে না। সুখ ও শান্তির অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে সুস্থ পরিবেশ। কোন পরিবারে, পাড়ায়, গ্রামে বা মহল্লায় যদি সুসম্পর্ক ও সম্প্রীতির পরিবেশ না থাকে এবং এরূপ পরিবেশে কোন শিশুর জন্ম হয়, তবে সেই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হওয়া সম্ভব নয়। আর যে মানুষ নিজেই মানুষ হিসেবে বিকশিত নয়, সে অপরের মানবিক বিকাশে সহায়তা করতে পারে না। যার মনে শান্তি আছে, অন্তরে যার সুখ আছে, সে কখনো অপরের অশান্ড়ির কারণ হতে পারে না। সুতরাং পরিবারে ও সমাজে শিশুদের বিকাশের জন্য সুস্থ পরিবেশ অপরিহার্য। এরূপ উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি অপরিহার্য, কেননা নাগরিক হিসেবে সমাজে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি বসবাস। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী জীবন যাপন করেও গণকল্যাণের স্বার্থে ধর্মের মৌলিক ও সার্বজনীন মূল্যবোধের ভিত্তিতে সবার সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে জীবন যাপন করতে হবে। কেননা নতুন প্রজন্ম অর্থাৎ আমাদের সন্তানেরা অন্তরে ঘৃণা, তিক্ততা, হিংস্রতা, বিদ্বেষভাব, শত্রুতা, দলাদলির মনোভাব নিয়ে গড়ে উঠুক, তা কারো কাম্য হতে পারে না। সে রকম পরিবেশ-পরিস্থিতি থাকলে সমাজে কখনো শান্ড়ি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই নিজ ধর্মবিশ্বাসে নিষ্ঠাবান থেকে পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে প্রতিনিয়ত সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর করে তুলতে সবাইকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করার উপায় হতে পারে নিম্নরূপ:

১। ব্যক্তি জীবনে, নিজ অন্তরে নিজের ও অপরের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করা। বাহ্যিক লোক-দেখানো শিষ্টাচার মানুষের কৃত্রিমতাই শুধু প্রকাশ করে।

২। নিজ নিজ পরিবারে ও মহল্লায় সকলকে সকল ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা। বিশেষ করে শিশু ও যুবাদের মধ্যে এই চেতনা গড়ে তোলা : "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

৩। কতকগুলো সার্বজনীন মূল্যবোধকে প্রাধান্য দেয়া ও তা বিস্ড়র করা, যেমন : -

- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সামাজিক অবস্থান, পদমর্যাদা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, দৈহিক সৌষ্ঠব, জাতীয়তা, পাপী বা ধার্মিক, শত্রু বা মিত্র নির্বিশেষে মানুষ হিসেবে, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে ব্যক্তি ও তার মর্যাদার মৌলিক সমতা স্বীকার করা।
- প্রতিটি মানুষের অন্তরের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা যে এক ও অভিন্ন – জীবনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও যে এক ও অভিন্ন, তা স্বীকার করা ও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করা।
- প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার স্বীকার করা ও তা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হওয়া।
- সার্বজনীন নৈতিক মূল্যবোধ লালন করা : বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী চলা, নিজের প্রতি ও অপরের প্রতি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।
- সার্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ লালন করা : শিষ্টাচার, শালীনতা, ভদ্রতা, অতিথিপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, পরার্থপরতা।
- সার্বজনীন আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং অপরকে সচেতন করে তোলা : সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস, শুচিতা, পবিত্রতা, ন্যায্যতা, সততা, সত্যনিষ্ঠতা, ক্ষমা, ভালবাসা।
- বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ : সকল মানুষ একই বিশ্বের বাসিন্দা এবং একই মানব পরিবারের সদস্য-সদস্যা হিসেবে পরস্পরের কাছে আমাদের প্রত্যাশা এবং পরস্পরের প্রতি দায়বোধ বৃদ্ধি করা।

- সম্মিলিতভাবে সকলের সাধারণ শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করা : অন্যায়, অসত্য, ঘুষ, দুর্নীতি, শোষণ, নির্যাতন, জুলুম, সন্ত্রাস, নিপীড়নমূলক দরিদ্রতা, ইত্যাদি দূরীকরণে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানো।
- ভিন্নতা বা বিভিন্নতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করা। সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্য তো বাস্তবতা। মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্য বিদ্যমান। কিন্তু বিভিন্নতা আর বিচ্ছিন্নতা এক কথা নয়। এমনকি মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষ মনের দিক দিয়ে এক হতে পারে। আবার মতের বিভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করাও মহত্বের লক্ষণ।

মানব পরিবারের সদস্য-সদস্যারা অনেক দিক দিয়েই ভিন্ন : দেশ, গোত্র, জাতি, ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, দৈহিক আকৃতি, গায়ের রং, লিঙ্গ, ইত্যাদি। তথাপি আমরা সবাই মানুষ। বাগানে যেমন বিচিত্র ধরনের ফুল শোভা পায় এবং তা বাগানের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে, তেমনি মানুষের মাঝে বৈচিত্র্য মানব পরিবারকে সমৃদ্ধ করে তোলে। সুতরাং, কোন প্রকার সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় না দিয়ে, মুক্তচিন্তা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বমানবতাবোধ অর্জন করার মধ্যেই সমাজের মঙ্গল নিহিত।

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ার জন্য প্রস্তাবমূলক বাস্তব কর্মসূচি :

- বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলা : সমবয়সীদের মধ্যে, গ্রামবাসীদের মধ্যে, স্কুল-কলেজে সহপাঠীদের মধ্যে সম্প্রীতির কালচার গড়ে তোলা। বিশেষ করে যুবকযুবতীরা বয়স্কদের চাইতে তুলনামূলক-ভাবে অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত থাকে, তাই তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই সার্বজনীন মূল্যবোধের ভিত্তিতে আন্তরিকতাপূর্ণ বন্ধুত্ব গড়তে পারে। স্কুল জীবনে পরস্পরকে তারা যতটা আন্তরিকতা নিয়ে যত বেশি চিনবে ও জানবে, পরস্পরের সম্বন্ধে ভুল ধারণা তত বেশি দূর হয়ে যাবে।
- বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরস্পরের সামাজিক (বিবাহ উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইত্যাদি) ও ধর্মীয় (পর্বদিনে যেমন, ঈদ, পূজা, বড়দিন, ইষ্টার, ইত্যাদি) অনুষ্ঠানাদিতে পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করা ও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা।
- পরস্পরের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় সভা-সম্মেলনে যোগদান করা। সেখানে জ্ঞানী-গুণীদের বক্তৃতা-ভাষণ থেকে অনেক কিছুই শেখা যায় এবং মনের সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়।
- সরকারীভাবে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন ধর্মের সার্বজনীন মূল শিক্ষাগুলো অন্তর্ভূক্ত করা হলে এবং শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকলে পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বাড়বে এবং মনের সংকীর্ণতা ও বদ্ধমূল নেতিবাচক ধারণাগুলো দূর হবে।
- পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে আলোচনা ও সহভাগিতার জন্য যৌথভাবে সভা-সম্মেলনের আয়োজন করা যায়। সম্প্রতি দেশের কয়েকটি জায়গায় এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং এতে অনেক সুফল পাওয়া গেছে। অনেকেরই ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেছে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে।
- দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আন্তঃধর্মীয় কর্মকান্ড প্রচার করা এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি গড়াকে উৎসাহিত করা।

বর্তমান বিশ্বে সম্প্রীতির সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। মানুষের মধ্যে দলাদলি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানির পরিবর্তে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। আর তা করার নির্দেশ সব ধর্মের মধ্যেই নিহিত আছে। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানকার জনগণ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাসী। তাই বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণও পরস্পরের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বজায় রেখে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সচেষ্ট থাকে। বিভিন্ন অফিস-আদালতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, হাটে-বাজারে ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে তারা একত্রে মিলেমিশে চলাফেরা ও কাজ করে। তারা পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়, পরস্পরের ধর্মীয় উৎসবাদিতে পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করে এবং নিমন্ত্রণ গ্রহণও করে। জাতীয় দিবস ও জাতীয় উৎসবগুলো একসাথে উদ্‌যাপন করে তারা পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর করতে সব সময় সচেষ্ট থাকে। সম্প্রতি বিভিন্ন ধর্মের জনগণের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ চলছে এবং এভাবে ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যথেষ্ট বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। এ নিয়ে আমরা গর্ব করি। নতুন বিশ্ব – বাইবেলের ভাষায় নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী, যেখানে "মানুষদের মাঝখানে পরমেশ্বরের আবাস! তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন; তারা হবে তাঁর আপন জাতি। স্বয়ং পরমেশ্বর তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; তিনি হবেন তাদের আপন ঈশ্বর। তাদের চোখ থেকে মুছিয়ে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল। তখন মৃত্যু আর থাকবে না, থাকবে না আর শোক, আর্তনাদ, দুঃখযন্ত্রণা (প্রত্যাদেশ ২১ঃ৩খ-৪ক)। – সেই নতুন সৃষ্টির আবির্ভাবের জন্য বর্তমান মুহূর্তে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলা অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপ : সাধু পল বলেন :"আমি যদি মানুষদের ও স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলতে পারি, অথচ আমার অন্ড়রে যদি না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতাল ছাড়া আর কিছুই নই! আর আমি যদি প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করতে পারি, যদি উপলব্ধি করতে পারি সমস্ত রহস্যাবৃত সত্য, জানতে পারি ধর্মজ্ঞানের সমস্ত কথা, যদি আমার অন্ড়রে থাকে পর্বত সরিয়ে দেবার মতো বিশ্বাস, অথচ না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি তো কিছুই নই! আর আমি যদি আমার সমস্ড়-কিছুই দীনদরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিই, এমনকি আমার নিজের দেহ-ও আগুনে সঁপে দিই, অথচ আমার অন্ড়রে যদি না থাকে ভালবাসা, তাহলে তাতে আমার কোন লাভই নেই! ... ভালবাসা নিত্য-সহিষ্ণু, ভালবাসা স্নেহকোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজীও নয়। পরের অপরাধ সে কখনো ধরেই না। অধর্মে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে; তার বিশ্বাস সীমাহীন, সীমাহীন তার আশা ও তার ধৈর্য। "

বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা প্রভু ঈশ্বর এক ও অভিন্ন; তিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব করে, একটি মানবপরিবারের সদস্য করে, নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। সকল মানুষের উৎস যেমন এক, তেমনি সকল মানুষের জীবনের লক্ষ্যও এক ও অভিন্ন। তাই যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আদেশ দিয়েছেন প্রতিবেশীকে অর্থাৎ মানবপরিবারের সকলকেই নিজের মতোই ভালবাসতে। এই ভালবাসাই মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলে। ক্ষণস্থায়ী এই বিশ্বসংসারে আমরা তীর্থযাত্রীর ন্যায়। যাত্রাপথে আমরা একা নই; একই বিশ্বপিতার সন্তান সকল মানুষ পরস্পরের ভাইবোন। তাই যাত্রাপথ সুদীর্ঘ ও বিপদসংকুল হলেও পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে আমাদের পথচলার ক্লান্তি লাঘব হয়। একই বিশ্বপিতার সন্তান এবং পরস্পরের ভাইবোন হিসেবে পরস্পরের সুখ-দুঃখ সহভাগিতা করে, ভাবের আদান-প্রদান করে, সকলকে একান্ত আপন মনে করে বন্ধুত্বপূর্ণ সংলাপে প্রবৃত্ত হয়ে পথ চলতে পারলে আমাদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করে। সেই শান্তিই তো প্রতিটি মানুষের অন্তরের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা।

মনে রাখুন

বর্তমান বিশ্বে সম্প্রীতির সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। মানুষের মধ্যে দলাদলি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানির পরিবর্তে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। আর তা করার নির্দেশ সব ধর্মের মধ্যেই নিহিত আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১৭.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীতে মানুষ হচ্ছে -

(ক) আগন্তুক ও পরবাসী
(খ) তীর্থযাত্রী
(গ) প্রভু ও অধিকর্তা
(ঘ) সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা

২। মানুষের মনের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা কি?

(ক) প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হওয়া
(খ) শান্ড়ি ও চিরস্থায়ী সুখ লাভ করা
(গ) দীর্ঘজীবন লাভ করা
(ঘ) বহু সন্তানের জনক/জননী হওয়া

৩। মানুষের মাঝে সম্প্রীতির সংস্কৃতি বা কালচার গড়ে তোলার নির্দেশ কোথায় নিহিত আছে?

(ক) পবিত্র শাস্ত্রে
(খ)মানবস্বভাবের মধ্যে
(গ) বাউল দর্শনে
(ঘ) সব ধর্মের মধ্যে

৪। মানবসমাজের প্রকৃত মঙ্গল কোথায় নিহিত?

(ক) ধনী-গরীবের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণের মধ্যে
(খ) দারিদ্র্যবিমোচনের মধ্যে
(গ) মুক্তচিন্তা, উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বমানবতাবোধ অর্জন করার মধ্যে
(ঘ) সকল মানুষের একই ধর্মের অনুসারী হওয়ার মধ্যে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রেরিতশিষ্য যোহন অনুসারে যীশুর প্রকৃত পরিচয় নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন। (পাঠ ১ ও সারসংক্ষেপ)

২। খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের আলোকে যীশুর মানবদেহ ধারণের সত্য ব্যাখ্যা করুন। (পাঠ ১)

৩। পবিত্র শাস্ত্রের প্রধান আদেশ দু'টি কি কি? এই আদেশের ভিত্তি কি? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন। (পাঠ ২)

৪। সত্যে ও আত্মায় উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা – ব্যাখ্যা করুন। (পাঠ ২, সারসংক্ষেপ)

৫। যীশুর শিক্ষা অনুসারে আমাদের "প্রতিবেশী" কে? দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বর্ণনা করুন। (পাঠ ৩)

৬। দয়ালু সামারীয়ের কাহিনী অনুসরণে বাস্তব জীবনে প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার অনুশীলন ব্যাখ্যা করুন। (পাঠ ৩, সারসংক্ষেপ)

৭। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কীভাবে প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার আদর্শ বাস্তবায়ন করতে পারি? বিস্ড়রিতভাবে লিখুন। (পাঠ ৩ ও সারসংক্ষেপ)

৮। যীশুর দেওয়া নতুন আদেশ কোন্‌টি? আদেশটি কীভাবে নতুন? বুঝিয়ে বলুন। (পাঠ ৪-ক)

৯। গুরু হয়েও শিষ্যদের পা ধোয়ানোর দৃষ্টান্ত দিয়ে যীশু আমাদের কী শেখাতে চেয়েছেন? (পাঠ ৪)

১০। ভালবাসা কীভাবে শ্রেষ্ঠ গুণ? ব্যাখ্যা করুন। (পাঠ ৪-খ)

১০। যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু কীভাবে ভালবাসার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ? ব্যাখ্যা করুন। (পাঠ ৪, সারসংক্ষেপ)

১১। সাধু পলের কথা অনুসারে শ্রেষ্ঠ গুণ ভালবাসার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা করুন। (পাঠ ৪, সারসংক্ষেপ)

১২। ক্ষমাশীল পিতা ও হারানো ছেলের কাহিনী অবলম্বনে পাপী মানুষের প্রতি ঐশপিতার ক্ষমার আদর্শ ব্যাখ্যা করুন। (পাঠ ৫ ও সারসংক্ষেপ)

১৩। হারানো ছেলের প্রতি তার পিতার আচরণ দিয়ে যীশু আমাদের কী শিক্ষা দিতে চেয়েছেন? ব্যাখ্যা করুন। (পাঠ ৫, সারসংক্ষেপ)

১৪। পবিত্র মঙ্গলসমাচার অনুসরণে অন্তিম বিচারের মানদন্ড ব্যাখ্যা করুন। (পাঠ ৬)

১৫। খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা অবলম্বনে ভ্রাতৃপ্রেমের গুরুত্ব যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করুন। (পাঠ ৬ ও সারসংক্ষেপ)

১৬। আদিখ্রীষ্টমন্ডলীর জীবনযাত্রার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। (পাঠ ৭ ও সারসংক্ষেপ)

১৭। বাংলাদেশে খ্রীষ্টমন্ডলীর প্রধান সেবামূলক কাজগুলো কি কি? বিস্তারিতভাবে লিখুন। (পাঠ ৭ : বিষয়বস্তু পরিচিতি)

১৮। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলার উপায়গুলো বিস্ড়রিতভাবে আলোচনা করুন। (পাঠ ৮: বিষয়বস্তু)

১৯। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতির ইতিবাচক দিক্‌গুলো উল্লেখ করে বিস্তারিত আলোচনা করুন। (পাঠ ৮: বিষয়বস্তু পরিচিতি)

উত্তরমালা

পাঠ ১: ১(ক), ২(ঘ), ৩(ঘ), ৪(খ), ৫(গ)

পাঠ ২: ১(গ), ২(ঘ), ৩(খ), ৪(ঘ)

পাঠ ৩ : ১(খ), ২(ঘ), ৩(ঘ), ৪(ক)

পাঠ ৪: ১(খ), ২(ক), ৩(খ), ৪(খ)

পাঠ ৫: ১(ঘ), ২(খ), ৩(ক), ৪(গ)

পাঠ ৬: ১(ক), ২(গ), ৩(খ), ৪(ক)

পাঠ ৭: ১(খ), ২(গ), ৩(গ), ৪(ঘ)

পাঠ ৮: ১(খ), ২(খ), ৩(ঘ), ৪(গ)